

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

^১হরেকৃষ্ণ হালদার এবং ^২মহুয়া মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা:

সাধারণ শ্রোতা হিসাবে কীর্তন গানের নানা উপকরণ সমন্বিত অর্থাৎ শ্রীখোল করতালের ধ্বনি আর সবে মিলে একসঙ্গে গান শুনেই কীর্তন গান বলে চিহ্নিত করে থাকি। ঈশ্বরের কৃতীকথায় গাঁথা যে গান তাকেই কীর্তন বলা হয়। কীর্তন কথাটি এসেছে “কৃ” ধাতুথেকে। কীর্তন কথার আভিধানিক অর্থ হল প্রশংসা। কোন দেবদেবীর লীলাগুনগান বা কোন মহাপুরুষের গুণ গরিমার বর্ণনাকে কীর্তন বলা হলেও মূলত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লীলাগুনগান করা বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাগুনগান বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের লেখা পদাবলী এক বিশেষ সুরে তালে আখর যোজনা করে, মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল করতাল সহযোগে কীর্তনীয়া দোহারবাদকগণ মিলে পরম্পরা গায়ন বাদন রীতিকে কীর্তন গান বলা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে নববিধ ভক্তির কথা বলা হয়েছে, তা হল-

“শ্রবণংকীর্তনংবিষ্ণুস্মরণংপাদসেবনম্।

অর্চনংবন্দনংদাস্যংসখ্যংআত্মনিবেদনম্।”

এই শ্লোকে “শ্রবণ ও কীর্তন” প্রথমেই উল্লেখ করেছে। অর্জুনের প্রপুত্র অভিমন্যুপুত্র রাজা পরীক্ষিত তক্ষক দংশনে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মুনিঋষিগণের পরামর্শে ব্যাসনন্দন শুকদেব মুনির কাছে ভগবৎ কথা শ্রবণ করেন। এই থেকেই ভাগবৎ সপ্তাহ বা পাঠকীর্তন চলে আসছে।

অন্যদিকে মহামুনি নারদ বীণাযন্ত্রে সদাই প্রভুর নাম গুণকীর্তন করেন। এই কীর্তন ধারাই পরবর্তীতে প্রচলিত কীর্তনগানের ধারা হিসাবে প্রবহমান। এই কীর্তন গান প্রধানত দুই প্রকার। পদাবলী কীর্তন এবং লীলা কীর্তন। লীলা কীর্তন আবার দুই প্রকার- নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা। এছাড়াও শ্রীচৈতন্যদেব কলির জীবের কল্যানার্থে তারকব্রহ্ম ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন।

এই কীর্তন গানের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল এবং করতাল বা কংস নির্মিত বাদ্যাদি ঘড়ি, কাঁসর, বাম্পু ইত্যাদি।

কীর্তনের আসরে কীর্তনীয়া ও বাদকগণ নৃত্য সহকারে কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন, যা গৌড়ীয় নৃত্যধারা হিসাবে বাংলায় তথা বাংলার বাইরেও পরিচিত। তাই কীর্তন গান কখনও বসে বা কখনও বা দাঁড়িয়ে গাওয়া হয়।

ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ধারা হিসাবে কীর্তন সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় অনাদি কাল থেকে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা বিদ্যমান। যে গানগুলি গাইতে “ও”, “হা” ইত্যাদি বর্ণগুলি ব্যবহার করা হত, সেই গানগুলিকে “ওহাটি গান” বলা হত। গৌড়ভূমির জন্য নির্দষ্ট “ওহাটি গান” ছিল। কীর্তন গানে “ও”, “হা”, “আরে” ইত্যাদি বর্ণগুলির প্রয়োগ রয়েছে এবং কীর্তন গানে বিলম্বিত গতির প্রাধান্য দেখে কীর্তন গানকে “ওহাটি গান”-এর ধারা বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

কীর্তন গানের মূল ধারাটি প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ দলগঠন পদ্ধতি বিচারে কীর্তন গানে “বৃন্দ গান” দলের সংগঠন পদ্ধতির নিয়মটি স্পষ্ট। নাট্যশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। “বৃন্দ গান বা ওহাটি” গানের যুগে প্রচলিত ছিল- ১) ভ্রমরগীত, ২) ভিক্ষুগীত, ৩) গোপীগীত, ৪) বেণুগীত, ৫) গোপীকায়ুগল গীত, ৬) রুদ্রগীত, ৭) রাসগীত, ৮) এলাগীত। এইসব গীতের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পাওয়া যায়। অম্বর ইলার বিরহে গান রচিত হয়েছিল, তা-ই “ইলাগীত” বা “এলা প্রবন্ধ” বলা হত। এই এলা প্রবন্ধের একটি নির্দিষ্ট ধারা গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যাকে বলা হত “গৌড়লা” বা “গৌড়লা প্রবন্ধ গীত”।

গৌড় ছিল পাঁচ খন্ডে বিভক্ত। এই পঞ্চ গৌড়ের অধিকর্তাকে “পঞ্চ গৌড়েশ্বর” বলা হত। “পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোজ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খান।” বৈষ্ণব পদকর্তাগণও তার উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থে- গৌড়ী রীতি, গৌড়ী গীতি, গৌড়ী রাগ (গৌড়কৌশিকী, গৌড়কৌশিক পঞ্চমা ইত্যাদি)-এর পরিচয় পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেব রচিত “সঙ্গীত রত্নাকর” গ্রন্থে লাট, কর্ণাট, দ্রাবিড়, অন্ধ ও গৌড় এই পাঁচপ্রকার প্রবন্ধ গীতিতে ভারতভূমির উল্লেখ আছে, তাছাড়াও গৌড়ীয় গীত, রীতি, রাগ, ধর্ম ইত্যাদির আলোচনা করেছেন। অগ্নিপু্রাণে গৌড়ীয় রীতি, কাব্য সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা আছে।

চর্যাপদগুলি ধর্মীয়, সাহিত্য ও সঙ্গীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পদকর্তা ভুসুক্ পাদ বঙ্গাল নামক লৌকিক রাগের প্রয়োগ করেছেন। ভাগবত ও অন্যান্য বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

“ললিতা বাজায় বীণা, বিশাখা মৃদঙ্গ।

সুচিত্রা বাজায় সপ্তসরা রাই দেখে রঙ্গ।”

“উজ্জ্বল নীলমণি”, “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু”, “বিদগ্ধমাধব”, “ললিতমাধব”, এছাড়াও জীব গোস্বামীর “গোপালচম্পু” কৃষ্ণদাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামৃতম্” এবং জয়দেব গোস্বামীর “গীতগোবিন্দ” প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থে গৌড়ীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কীর্তন (ওহাটি বা গৌড়লা বা কীর্তন) গৌড়ীয় নৃত্য এবং গৌড়ীয় বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

এছাড়াও মন্দিরের গায়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নৃত্যভঙ্গিমায় বাদ্যরত বৃন্দগীত প্রথার গৌড়ীয় রীতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

মন্দির নগরী বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে টেরাকোটাগুলি বাংলার সেই প্রাচীন সঙ্গীতরীতির পরিচয় বহন করে চলেছে। হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দিরের পাশে অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেও তা লক্ষ্য করা যায়।

গৌড়বঙ্গের সঙ্গীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) গৌড়, বঙ্গ, বঙ্গাল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং বাংলার গীত-বাদ্য-নৃত্য ও শিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি গৌড়ীয় নামেই পরিচিত ছিল। তাই প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে গৌড়ীয় তথা বাংলার গীত-বাদ্য-নৃত্য ধারা একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, পুঁথি, শাস্ত্রে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে। শুধুমাত্র আমাদের অস্বেষণের অপেক্ষা।

কীর্তন বাংলায় প্রচলিত এক বিশেষ ভক্তিমূলক সঙ্গীত ধারা। এই কীর্তন গান তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে সংগঠিত হয়ে (সাসঙ্গীতিক, সাহিত্যিক, পারমার্থিক) অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রবহমান। এই কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করেন ভক্তগণ। কীর্তন গানের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- গাছগান, দাগীগান, আখর, ঘটকালী, মূল গায়ন, দোহার, বায়েন ইত্যাদি। তাল প্রকরণেও রয়েছে লোফা, দাসপেড়ে, তেওট, দশকুশি ইত্যাদি খেতুরি মহোৎসবে তিনটি ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। ১) মনোহরশাহী, ২) গড়ানহাটি, ৩) রেনেটি এবং পরবর্তীকালে আরও দুটি ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা- ১) ঝাড়খন্ডী, ২) মন্দারিনী।

কীর্তনে রয়েছে অপ্রাকৃত রসানুভব। শ্রীমতি রাধারানী এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দুইয়ের লীলাবিলাসের কেন্দ্রস্থ লীলারস, মহাজন পদকর্তাদের কলমে, বিচিত্র লীলারসের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- গোষ্ঠ, সূর্যপূজা, রূপানুরাগ, রাসলীলা, অলস ও কুঞ্জভঙ্গ ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের কল্যাণার্থে হরিনাম সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। এই হরিনাম সংকীর্তনে সহজ সরল সুর ও তালের সংযোজন করে গাওয়া হয় তাতে মানুষের চিন্ত বা মন মার্জিক হয় এবং আধ্যাত্মিক একা স্থাপন করেন।

নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিন্তাশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদগম॥^২

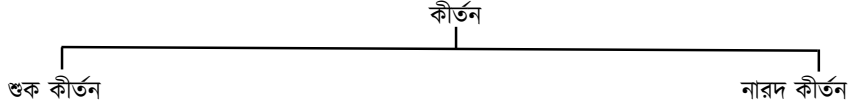
শ্রীখোল ও করতালসহযোগে ভাবময় নৃত্য ভঙ্গিমায় অগণিত ভক্ত সঙ্গে সপার্ষদ নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর ভাবাদর্শে জাতপাত ভুলে উঁচুনিচু ভেদ মুছে ফেলে অসংখ্য মানুষ দলে দলে যোগদান করে এই হরিনাম সংকীর্তনে। তাই শাস্ত্রে রয়েছে-

খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥^১

শার্ঙ্গদেবকৃত “সঙ্গীত রত্নাকর” গ্রন্থে রয়েছে “গূতং বাদ্যং নৃত্যং ত্রয় সঙ্গীতসমুচতে” অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনের সমন্বয়ে “সঙ্গীত”।

কীর্তন কি?

ঈশ্বরের কৃতীকথায় গাঁথা যে গান তাকেই কীর্তন বলা হয়। কীর্তন কথাটি এসেছে “কৃ” ধাতুথেকে। কীর্তন কথার অভিধানিক অর্থ হল “প্রশংসা”। কোন দেব দেবীর লীলা গুনগান বা কোন মহাপুরুষের গুনগরিমার বর্ণনা কে কীর্তন বলা হলেও মূলত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা গুনগান করা বা শ্রী মহাপ্রভুর বিষয়ক বর্ণনামূলক পদাবলী এক বিশেষ সুরে তালে আখর যোজনা করে গাওয়ার রীতিকে কীর্তন গান বলা হয়।



শুক কীর্তন – ব্যাসনন্দন শুকদেব মুন অজুনের প্রপুত্র রাজা পরাক্ষকে জাবনের শেষ সাতাদন যে ভগবৎ কথা শ্রবণ করান তাকে বলে “শুক কীর্তন”।

নারদ কীর্তন – নারদ মুনি বীণা যন্ত্রে সুর ও তাল সংযোজন করে যে কীর্তন করতেন তাকে নারদ কীর্তন বলা হয়।

উদ্দেশ্য – কীর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য হল ভক্তি ও প্রেম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শাস্ত্রে নয়টি পন্থার কথা উল্লেখ রয়েছে- শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সখ্য, আত্ম নিবেদন, পাদ সেবন।

“শ্রবণং কীর্তনং বিজ্ঞো: স্মরণং পাদসেবনং।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মা নিবেদনং”^৪

কীর্তনের মূল বিষয় কি?

কীর্তনের বিষয় অপ্রাকৃত রস, শ্রীমতি রাধারানী রসবতী এবং শ্রীকৃষ্ণ রসময় এই দুয়ের রসবিলাসের ভিত্তিতে কীর্তনের বিভিন্ন পর্যায় রচিত হয়, যা অপ্রাকৃত রসের পূর্ণসম্পূট বা কোটা শাস্ত্রে আছে-

“রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোনে বিলাসে রস আশ্বাদন করি।”^২

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব আশ্বাদনই হল কীর্তনের মূল বিষয়বস্তু। এই রস আশ্বাদন করতে যে পাঁচটি পথের স্মরণ নেয় ভক্তগণ তা হল- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

এই মধুর ভি়ানে (রসে) রয়েছে নায়ক ও নায়িকার ভেদ। কৃষ্ণলীলা নায়কের ছিয়ানব্বইটি রসের প্রকারভেদ পাওয়া যায়। নায়ক মূলত চারপ্রকার। ১) ধীরোদাও, ২) ধীরললিত, ৩) ধীরোদ্ধত ও ৪) ধীরশান্ত। এই চারপ্রকার আবার তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মোট ১২ প্রকার হয়। এই তিন অবস্থা হল- ১) পূর্ণতম, ২) পূর্ণতর ও ৩) পূর্ণ। এই ১২ প্রকারে আবার দুইটি ভেদ আছে- ১) পতিভেদ ও ২) উপপতিভেদ। অর্থাৎ এই নায়ক প্রকার হল ২৪টি। এই নায়ক আবার ১) অনুকূল, ২) দক্ষিণ, ৩) শঠ ও ৪) ধৃষ্টভেদে মোট $২৪ \times ৪ = ৯৬$ প্রকার হয়। লীলা প্রকটের জন্য নায়কের সহায়ক পাঁচটি চরিত্র থাকে। যেমন- চোট, বিট, বিদূষক, পিঠমর্দ এবং প্রিয়নর্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্ব শ্রেষ্ঠ বলে বৈষ্ণব ভক্তগণের সিদ্ধান্ত।

তেমনি নায়িকা বিচারেও মূল দৃষ্টিভঙ্গী তিনটি- স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সাধারণী। এই স্বকীয়া ও পরকীয়ার আবার তিনটি করে ভেদ আছে- মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা। এর মধ্যে মধ্যা ও প্রগলভা নায়িকার তিনটি প্রকার ভেদ আছে- ধীর, অধীরা ধীরধীরা অর্থাৎ এ পর্যন্ত স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে নায়িকা হল $(৩ \times ২ + ১) \times ২ = ১৪$ + সাধারণী (কন্যা) মোট ১৫টি প্রকরণ। এদের আবার আটটি করে প্রকার আছে। যথা- অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খন্ডিতা,

বিপ্রলক্ষা, কলাহস্তরিতা, প্রোষিতাভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। প্রতিটি আবার তিনটি ভেদ আছে- উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা অর্থাৎ নায়িকার মোট প্রকারভেদ হল = $(১৫ \times ৮ \times ৩) = ৩৬০$ ।

এই প্রকার গুণগুলি নায়িকা হিসাবে কেবল শ্রীমতি রাধারানীতেই বর্তমান। শাস্ত্রে আছে-

“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।

স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাহার।”^২

প্রাকচৈতন্য যুগ

বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী

বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বর ভক্তি পরায়ন, ব্রাহ্মণ ভোজ দেবের গুণে তৎপত্নী বামদেবীর গর্ভে কবি জয়দেবের জন্ম হয়। জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পদ্মাবতীর পানিগ্রহণ করেন জয়দেব এবং পৈতৃক আধকাঠা ভিটেয় কুটির নির্মাণ করে রাধামাধবের যুগল বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃষ্ণাধ্যান ও কৃষ্ণলীলা রচনায় নিয়োজিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের লীলাকথামৃত “গীতগোবিন্দ” অমর সৃষ্টিতে পরম কৃপার স্পর্শ লাভ করেন।

“প্রিয়ে চারুশীলে” প্রমুখ গীত রচনা কালে “স্মর গরল খন্ডন মমশিরসি মন্ডলম্”-এ পর্যন্ত লিখে তাঁর কলম থেমে গিয়েছিল। এর পরবর্তী অংশ “দেহিপদপল্লবমুদারং” স্বয়ং ভগবান লিখে দিয়েছিলেন।

জয়দেব একাধারে তবি অন্যদিকে গায়ক ও বাদক তাঁর রচিত পদাবলীর “বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি হরতিদর তিমির মতি ঘরম্”- এই অংশটি নিয়ে অষ্টতাল গুচ্ছ সংকলন করেছিলেন তা আজও বাংলার কীর্তনের ইতিহাসে অমর কীর্তি হয়ে রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল-

১। নাম	বোল					
	+	০	২	৩	০	
আড় -	ধোগুরুর	দিও	ধোগা	তি	-	
	১	২	৩	৪	৫	

২। নাম	বোল					
	+	০	২	০	৩	০
দোজ -	গুরুরধো	তাতাথেটে	তাগুরুর ধোগা	তিনি নাও	তি	নাও
	১	২	৩	৪	৫	৬

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

৩।	নাম	বোল					
		+	০	২	০	৩	৪
যতি -		ধোঁধো	তাতধো	দেতা খেটা	তাগুরুধো	তিনি নাও	তি নাও
		১	২	৩	৪	৫	৬

৪।	নাম	বোল					
		+	০	২	০	৪	০
শশিশেখর -		ধো	দিত্তা	গুরুধো	দিত্তা	তাতধো	দেতা খেটা
		১	২	৩	৪	৬	
		৬	০	৮	০		
		তাগুরুধো	তিনি নাও	তিনাও	--		
		৮	৯	১০	১১		

৫।	নাম	বোল					
		+	০	২	০	৩	৪
গজ্ঞন -		ধোগুরুধো	ধোগা	তিৎঝাঁ	নাওগুরুধো	তিৎঝাঁ	তিনিতিনি
		১	২	৩	৪	৫	৬
							৭
							৮

৬।	নাম	বোল					
		+	২	০	৩	০	৪
পঞ্চম -		ধোঁধো	তাতধো	তাতাখেটা	ধোগুরুধো	দিত্তা	ধোগা
		১	২	৩	৪	৫	৬
							৭
							৮

৭।	নাম	বোল		
		+	২	০
রূপক -		তাতা খেটা	খেটা নাও	নাও নাও
		১	২	৩

৮।	নাম		বোল					
	+	০	২	০	৩	৪	০	
সম: -	ধো খেটা	তাৎধো	তাতাখেটা	ঘোনাতিনি	তাঘেনতা	ঘোনাও	তাততা--	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	

অতুলনীয় কবিত্ব গুণসম্পন্ন ও সঙ্গীতজ্ঞ মহাবৈষ্ণবকে সভাকবি রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, বঙ্গের সেন রাজকুল তিলক লক্ষ্মন সেন। অপরিমিত সম্মান ও ঐশ্বর্য পেয়েও শ্রীকৃষ্ণের চরণ মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি ভক্ত কবি জয়দেব গোস্বামী।

বড়ু চন্ডীদাস – বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান রচনা করেন কবি চন্ডীদাস। বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাঁকুড়ার কাঁকিল্য গ্রাম থেকে গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” নামে প্রকাশ করেন।

গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে গতি প্রকৃতি বিচার করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন প্রাকচৈতন্য যুগে কোন এক সময়ে রচিত হয়েছে।

কীর্তন গানের জন্যই কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল।

১। কীর্তন সুলভ ঝংকার আছে।

২। রাগের নাম উল্লেখ আছে। যেমন,- পাহাড়ী, গৌড়ী ইত্যাদি।

৩। কাব্যের রচনা শৈলীতে সমকালীন নাট্যসঙ্গীতের ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন-

“যবে রাধা গোয়ালিনী পাতাল কৈল গাত্র

হে হে লহে।”^৪

এই রচনার ছন্দে কতকগুলি নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা থেকে অনেক সময় যাত্রাগানের মত অঙ্গভঙ্গির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

ভগবত পুরাণাদি থেকে উপকরণ আহরণ করে কবি প্রতিভার সাহায্যে বিচিত্র আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিরহের যে রূপ আলেখ্য রচনা করেছেন, তা পরবর্তীকালে রসিক শ্রোতা, ভক্ত বৈষ্ণবগণের বিশেষ আনন্দ ও লীলার আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব এনে দিয়েছে। চন্ডীদাসের সাহিত্য কাহিনী প্রকরণ বা ভাষা যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ।

জন্মখন্ডে : কৃষ্ণের পূর্বরাগ ও বাসনা সঞ্চরণ এবং বড়াইকে দিয়ে প্রেমের অভিজ্ঞান স্বরূপ কর্পূর, তাম্বুল, পুষ্প প্রেরণ, রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বড়াই লাঞ্ছনা।

দানখন্ডে : শ্রীকৃষ্ণের দানীবেশ ধারণ করে, শ্রীরাধার যৌবন সম্ভোগ প্রার্থনা।

নৌকাখন্ডে : শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস এবং গোপীদের সঙ্কটে নিক্ষেপ ও উদ্ধার।

বৃন্দাবনখন্ডে : বড়াইয়ের পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য শ্রীরাধার অভিসার।

রাধা বিরহ খন্ডে : শ্রীরাধা সঙ্গে দায়িত্ব কৃষ্ণের মিলন, তারপর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান।

এমন বিচিত্র কাহিনী ইতিপূর্বে আর রচিত হয়নি। এই সরস কাব্যের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, শ্রীরাধার পূর্বরাগ, দানলীলা, নৌকাবিলাস, অভিসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পালাগুলি সৃষ্টি হয়েছে। চণ্ডীদাসের রচনাতেই বাংলা পদাবলীর প্রধান উদ্দীপনা ও উৎকর্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন-

ক) উত্তরবঙ্গের জাগগান

খ) রাঢ়বঙ্গের কুমুরগান

গ) আসামের কুশলগান ইত্যাদি।

মালাধর বসু – বাংলা প্রাকচৈতন্য যুগে বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে মালাধর বসুর জন্ম হয়। কৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল কাব্য ১৪৭৪ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন। তৎকালীন গৌড়ের বাদশাহ রুকনুদ্দিন বরবক তাকে গুনরাজ উপাধি দেন। তাঁর সমগ্র গ্রন্থটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত-

১। আদি কাহিনী - শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা গমন।

২। মধ্য কাহিনী - কংসবধ থেকে দ্বারকা গমন।

৩। অন্ত কাহিনী - দ্বারকা ধ্বংস থেকে তনুত্যাগ।

মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খাঁন গ্রন্থখানি পুরীতে মহাপ্রভুকে অর্পণ করেন। খুব খুশী হয়ে চৈতন্যদেব বলেন-

“কুলীন গ্রামের অধবাসী যে হয় কুকুর।

সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদূর।”

যশোরাজ খান – বঙ্গদেশে প্রথম ব্রজবলী ভাষায় পদরচয়িতা হিসাবে যশোরাজ খানকে ধরা হয়। তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় লেখা শ্রীরাধার অভিসার পর্যায়ে একটি পদ হল-

এক পয়োধর চন্দনে লেপিত

আবর সহজই গোর

হিম ধরাধর কনক ভুধর

কোলে মিলন জোর॥

.....

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোজ পুরন্দর

ভনে যশোরাজ খান॥^৩

এই বংশেই শ্রীখন্ড গ্রামে নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। এই শ্রীপাঠ শ্রীখন্ড কাটোয়ার কাছে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত।

কবি বিদ্যাপতি – রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাব্যশ্রষ্টাদের অন্যতম কবি বিদ্যাপতি। ব্রজবুলি ভাষায় “কীর্তিলতা” এবং “গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী” ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজা শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন বিদ্যাপতি। কবিত্ব শক্তির জন্য ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে “বিসফী” নামক গ্রামটি উপহার স্বরূপ পান। তিনি একাধারে সঙ্গীত তত্ত্ববিদ অন্যদিকে কবি ও গায়ক যার কৃতি জগতের বুক চিরন্তন হয়ে বেঁচে রয়েছে। যার প্রভাব বাংলাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। তাই কবিরঞ্জনকে বলা হত ছোট বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ দাসকে বলা হত দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির কিছু পদ গোবিন্দ দাস সম্পূর্ণ করেছিলেন-

“বিদ্যাপতি কহ নিকরন মাধব।
গোবিন্দ দাস রস পুর||”^৩

বিদ্যাপতির রচনাতে প্রকৃত রসের প্রভাব বেশী একথা সত্য। কিন্তু সমস্ত রচনার মধ্যে অন্তসলিলা ফল্লুধারার মত যে ভক্তিবাদ তথা বৈষ্ণববাদের সংস্কার রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ভাবময় তার কাব্য কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসকে যথোচিত সংযত করে কিভাবে কাব্য সম্পূর্ণে আবদ্ধ রাখা যায় তার যথার্থ নির্দেশন হল কবি বিদ্যাপতির পদাবলী।

“প্রেম কি অঙ্কুর আত জাত ভেল।
না ভেল যুগল পলাশ||”

শ্রীচৈতন্য যুগ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবৎ সত্ত্বার মহিমা যখন প্রকাশ পেল তখন তাঁর পার্শ্বদর্শী ছাড়াও ভক্তবৃন্দগণ এমনকি মুসলমান কবিও শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ কীর্তন গাইতে এবং লিখতে লাগলেন, ফলে সাহিত্যের ভান্ডার পূর্ণ হতে লাগল। এছাড়া বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর নির্দেশে রূপ ও সনাতন যাদের পূর্বনাম “দাবির খাস”, “শাখর মল্লিক” তাঁদের দ্বারা গোস্বামী পরম্পরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা ও প্রচার শুরু হয়ে যায়। এই পদ রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছে।

১। **মুরারী গুপ্ত** ছিলেন মহাপ্রভুর সহপাঠী – কবি ও গায়ক

২। **বৃন্দাবন দাস ঠাকুর** বর্ধমান জেলার দেনুর গ্রামে অবস্থিত “দেনুর পাঠবাড়ী” সেই গ্রামেই জন্ম হয় বৃন্দাবন ঠাকুরের – তিনি মহাপ্রভুর মানসপুত্র, তার প্রধান রচনা- “চৈতন্য ভাগবত”, তত্ত্ববিলাস, দধিখন্ড, বৈষ্ণব বন্দনা ইত্যাদি।

অধিবাস কীর্তনের তাঁর বিশেষ পদ-

নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ।
কৃপা করি কর আগমন।
.....
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করিবেন আশ্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সকল ভকত বৃন্দ
গুণগান বৃন্দাবন দাস||^৪

৩। **বলরাম দাস** - পিতা- আত্মারাম দাস, মাতা- সৌদামিনি, জাতিতে বৈদ্য, নিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষ অনুগত। তাঁর বিশেষ পদ-

“গৌর বরণ মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, টলিল সকল দেশ।”^৩

৪। **জগন্নাথ দাস** -উড়িয়া কানাই খুঁটিয়া মহাশয়ের পুত্র জগন্নাথ দাস। তাঁর লেখা নৌকাবিলাস পর্যায়ের একটি বিশেষ পদ-

“বড়ই ঐকি ঘাটের নেয়ে, কোথা হতে আসি দিল দরশন,
বিনোদ তরণী বেয়ে।”^২

৫। **জগদানন্দ দাস**-পদকর্তা জগন্নাথ দাস ছিলেন যেমন শাক্তজ্ঞ, তেমন সঙ্গীতজ্ঞ। বহুবিধ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা একটি বিশেষ পদ-

“জাগহু বৃষভানু নন্দিনী, মোহন যুবরাজ।^১
এবং দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।”^২

৬। **নরহরি সরকার ঠাকুর** -বর্ধমান জেলার শ্রীপাঠ শ্রীখণ্ডে কহিরাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। শ্রীভজনামৃত নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

“পদ কল্পতরু” গ্রন্থে পাওয়া যায় তাঁর অনেক পদ-
“শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলায় হারা।”

.....
গৌর শব্দ গৌর সম্পদ সদা যার হৃদে জাগে।
নরহরি দাস অনুগত তার চরণে শরণ মাগে।^৪

তাঁর আরও দুই ভাই মাধব দাস ও মুকুন্দ দাস তাঁরাও পদ রচয়িতা ছিলেন।

৭। **লোচন দাস** -শ্রীনরহরি সরকার মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন লোচন দাস ঠাকুর। পিতা- কমলাকর দাস, মাতা- সদানন্দী দেবী। জন্ম ১৪৪৫ শকাব্দে, তিরোভাব ১৫৩০ শকাব্দে। তিনি বহুপদ রচনা করেছিলেন-

“নিতাই গুণমণি আমার গৌর গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী।”^৪

৮। **জ্ঞান দাস** -বর্ধমানের কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য পদ রচনা করেন। যেমন-

“রূপলাগি আঁখি বুড়ে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।”^২

৯। বাসুদেব ঘোষ -বৃন্দাবন লীলার অনুরূপ প্রায় সমস্ত গৌরাজ লীলার পদ রচনা করেন। যেমন- রাসলীলায় তার লেখা গৌর চন্দ্রিকার পদ-

“বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল
যমুনার ভাব সুর ধুনীয়ে করিল||”^১

বাসুদেব ঘোষের আরও দুই ভাই মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ তাঁরাও পদ রচয়িতা ছিলেন। এছাড়াও এই সময়ে অনেক পদকর্তা গৌর বিষয়ক পদ রচনা করে, সাহিত্য সম্পদের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন।

১০। বংশী দাস-পদকর্তা বংশী দাস বহু পদ রচনা করেন। তাঁর অধিবাস কীর্তনের একটি বিশেষ পদ-

“জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাজ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া
করে খোল মঙ্গলের সাজ||
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়া আনন্দ করি।
বংশী বলে দেহ জয় রব||”

শ্রী চৈতন্যোত্তর যুগ

মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধুরি গ্রাম। পদ্মানদীর এপারে ভগবান গোলার নিকটে, কবিরাজ পরিবারে দুই ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র ছিলেন বৈষ্ণব আর গোবিন্দ দাস ছিলেন শক্তির উপাসক। একদিন গোবিন্দ অসুস্থতার কারণে রামচন্দ্র সেবা নিবেদন করেন মায়ের মন্দিরে কিন্তু গোবিন্দ প্রসাদে এক অপূর্ব স্বাদ অনুভব করেন। তাঁর মনে কৌতুহল মেটাতে মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়। রামচন্দ্র রাধাগোবিন্দের প্রসাদ আমায় নিবেদন করেছে, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। তারপর থেকেই গোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব হয়ে যান। তাঁর প্রথম পদ-

“ভজছঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণার বিন্দুরে।
মনুষ্য দুর্লভ জনম সংসঙ্গ, তরহ এ ভব সিঙ্কুরে||”^২

.....

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন, পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীগণ আত্মনিবেদন, গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে||^৩

এমন অসংখ্য পদ তিনি লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য এখন যে কোন পালায় গোবিন্দ দাসের পদ অবশ্যই গেয়ে থাকেন কীর্তনিয়াগণ, যাকে বলা হত দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, তাঁর প্রায়ই পদ খুব জনপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রধান পদটিই হল গোবিন্দ দাসের-

“শারদ চন্দ পবনমন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধরে।
ঐছনে মিলল গোবুল চন্দ, গোবিন্দ দাস বোলনী||”^৪

নরোত্তম দাস ঠাকুর – রাজশাহী পরগণার খেতুরী গ্রামে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়নী। নরহরি চক্রবর্তী কৃত “ভক্তি রত্নাকর” গ্রন্থের দশম তরঙ্গে আছে-

“গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে॥
সে সময়ে তাহা প্রেম সম্পূর্নে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু তবে উজারিল॥”^২

অর্থাৎ গীতপ্রথা রক্ষার জন্যই বা কীর্তন সঙ্গীতের উৎকর্ষের নিমিত্তে ঠাকুর নরোত্তমের প্রয়োজন ছিল। নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে যাবার সময় বন্দনা করতে লাগলেন-

“আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব মধুর বৃন্দাবন॥”^৩

তার মনের ইচ্ছা বৃন্দাবনের যুগলকিশোর ভজনা, তাই তিনি লিখেছিলেন-

“রাধা কৃষ্ণ প্রেম মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥”

.....

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস,
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥^৪

রাধামোহন – রাধামোহন দাসের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার যাজীগ্রামে। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপুত্র। তিনি বহু পদ রচনা করেছিলেন-

১। মধুকর রঞ্জিত, মালতি মন্ডিত, জিত ঘন কুণ্ডিত কেশম্।

২। মান বিরহ জ্বরে পঁছ ভেল ভোর, ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিলোর॥ ইত্যাদি অসংখ্য গৌর বিষয়ক এবং অসংখ্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়।

ঘনশ্যাম দাস – পদকর্তা ঘনশ্যাম দাস গৌর বিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বিভিন্ন পর্যায়ের বহু পদ রচনা করেছিলেন।

“যা দেখিনু যমুনার তটে, সেই দেখি এই চিত্রপটে
যার নাম কহিলে বিশাখা, সেই এই পটে আছে আঁকা॥
পুন কহে পাইয়া চৈতন কি দেখিনু দেখাও সেজন
সখীগণ করয়ে আশ্বাস, ভনে ঘনশ্যাম দাস॥”^৫

এমন বহু পদকর্তাদের নাম শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে পাওয়া যায়। যেমন- শশীশেখর দাস, চন্দ্রশেখর দাস, দ্বিজভীম দাস, উদ্ধব দাস, মনোহর দাস, বলরাম দাস, নয়নানন্দ দাস, দীনকৃষ্ণ দাস, বিশ্বম্ভর দাস, পল্লবী দাস, জগন্নাথ দাস, বিপ্রদাস ঘোষ, দাস পূর্ণানন্দ, দাস রঘুনাথ, দীনবন্ধু দাস, শিবরাম দাস, যাদবেন্দ্র দাস।

এছাড়া আরও অসংখ্য পদকর্তা শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে গৌরাজ্ঞ এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। এসব পদকর্তাদের বলা হয় “মহাজন”। কারণ এঁারা সকলেই কবি ও গায়ক অর্থাৎ বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি ভক্ত বিশেষ। তবে এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মহাপ্রভুর পার্শ্বদর্শকের বংশাবতঃ।

তবে নরোত্তম ঠাকুরের সাহিত্যের অনুপ্রেরণাতেই পরবর্তীকালে অনেকেই পদ রচনার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। খেতুরী কীর্তন মহোৎসবের পরবর্তীকালে কীর্তনধারার কিছু বাহকগণের নাম, যেমন- কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র, মনোহর চক্রবর্তী, রসিক দাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য যুগে নবদ্বীপে শ্রীবাস আঙ্গিনা ছিল তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের প্রধান কেন্দ্র। যেখানে মহাপ্রভু অন্তরঙ্গদের নিয়ে রস আশ্বাদন করতেন এবং বহিঃসঙ্গ ভক্তদের নিয়ে নাম সংকীর্তন করতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেল সমাজ, নামে আশ্রয় নিল জগাই মাধাই-এর মতো মহাপাপী, উদ্ধার হলেন চাঁদ কাজী। মহাপ্রভুর সম্পত্তি ছিল শ্রীখোল ও করতাল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে অগণিত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নর্তন কীর্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গৌরবময় অধ্যায় রচিত হল।

“প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।

উত্তম অধম কিছু না করে বিচার||”^৬

শান্তিপুরে ছিলেন অষ্টভ্যাস্য, যার গৃহে গৌরনিতাই হরিনাম সংকীর্তনের বিধান দিতেন। নামাচার্য ব্রহ্মহরদাস ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। তিনি ছিলেন হরিনাম প্রচারের বিশেষ কাভারী। কাজীর নির্দেশে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করেও তাঁর মুখ থেকে হরিনাম বন্ধ করতে পারেনি কাজীর চরণ।

তাই দেখা যায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব বললেন-

“পৃথিবীতে যত আছে নগর আদি গ্রাম।

সর্বত্র প্রচার হইবে এই হরিনাম||”^৭

কীর্তনের শ্রেণী

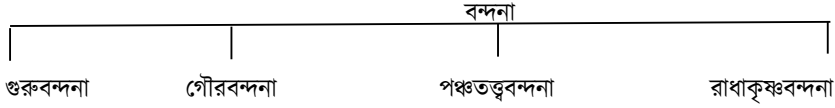
সাধারণ শ্রোতা হিসাবে কীর্তনগানের নানা উপকরণ সমন্বিত অর্থাৎ শ্রীখোল করতালের ধ্বনি আর সবে মিলে একসঙ্গে গান শুনেই কীর্তন বলে চিহ্নিত করে থাকি। কীর্তন নিজে একটি গানের শ্রেণী হলেও কীর্তনের আবার বিষয়ভিত্তিক বা প্রয়োগভিত্তিক কয়েকটি ধরন আছে- এগুলিকেই কীর্তনের শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক আলোচনায় কীর্তনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে- যার একটি হল কথাকীর্তন বা পাঠকীর্তন যাকে বলা হয় “শুককীর্তন”। অপরটি হল “নারদ কীর্তন” বা “কীর্তন গান”। এই কীর্তন গানের শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ-

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

১। বন্দনা কীর্তন, ২। প্রার্থনা কীর্তন, ৩। আরতি কীর্তন, ৪। অধিবাস কীর্তন, ৫। পরব কীর্তন, ৬। সূচক কীর্তন, ৭। নাম কীর্তন ও ৮। লীলা কীর্তন।

১। বন্দনা কীর্তন -

বন্দনা হল বৈষ্ণবীয় নববিধা ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ, সেজন্যই নানাবিধ বন্দনা নানাভাবে লেখা হয়েছে। যেমন- ক) গুরু বন্দনা, খ) গৌর বন্দনা, গ) পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, ঘ) রাধাকৃষ্ণ বন্দনা ও ৫) বৈষ্ণব বন্দনা। “বন্দনা গান” মঙ্গলগান কড়া সূত্রেই উদ্ভূত। প্রাচীনকালের নিয়ম অনুযায়ী যেকোন গ্রন্থকার গ্রন্থ সৃষ্টির প্রারম্ভেই যে যার উপাস্য দেবতা সকলকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ভাষায় একটি করে বন্দনা লিখতেন। মঙ্গলগানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল এছাড়াও মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, দেবীমঙ্গল ইত্যাদি সব গানেরই প্রথম অংশে গায়ক পরিচিতি ও বন্দনা থাকে এবং এই বন্দনার অংশটি খুবই আকর্ষণীয়। তবে এসব ক্ষেত্রে বন্দনা অংশটি হল মঙ্গলগানের আঙ্গিক কিন্তু কীর্তনের ক্ষেত্রে বন্দনা নিজেই একপ্রকার গান। সব বন্দনা গানই সহজ তালে এবং পরিচিত সুরে গাওয়া হয়, যেন সকলেই এ গানে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভাবুক গায়ক এসব বন্দনা গানের সঙ্গে ভক্তদের অন্তরের কিছু কিছু ভাবের উপযুক্ত আখর সংযোজন করে, বন্দনা গানকেই কীর্তনের একটি বিশেষ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে থাকেন।



ক) গুরু বন্দনা বিষয়টি বৈষ্ণব সাধনার একটি মৌলিক নীতি, কারণ ভজনের মূল পথপ্রদর্শকই হলেন গুরু এবং গুরু কৃষ্ণ অভিন্ন সত্ত্বা বলে কৃষ্ণ বুদ্ধিতে নানাবিধ সেবা করে থাকেন।

মূলপদ - “শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজনধন
তাহে করল উপদেশ||”

আখর - ১। নিরজনে ভজ গিয়া
 ২। শ্রীরাধামদনগোপাল পদ
 ৩। ভজিলে আনন্দ পাবে। -ইত্যাদি

মূলপদ - “নির্মল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পুরণয়ল সব মন আশ।”

আখর - ১। কেউত বাকী রইল নারে
 ২। আমি বাকী রইলাম পরে
 ৩। ভবসংসার পারাবারে। -ইত্যাদি

মূলপদ - “সোচরণাশ্রুজে রতি নাহি হোয়ল

রোয়ত বৈষ্ণব দাস।”

আখর -

১। কি হবে গতি, এখন আমার

২। শ্রীগুরুপদে না হল মতি

৩। বৃথা হল আসা যাওয়া। -ইত্যাদি

এমন আরও অনেক গুরুবন্দনা গান আছে। ঠাকুর নরোত্তম খুব স্পষ্টভাবে, সুশৃঙ্খল ও সরল বাংলা ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

খ) **গৌর বন্দনা** কীর্তনের প্রাক্কালে আবশ্যকীয় বলে নানা পদ রচনা হয়েছে। বিশেষত: নরহরি সরকার এবং নরোত্তম দাসের পদগুলি নানাভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। লীলা কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা প্রচলিত হওয়ার দরুন পৃথকভাবে কোন গৌরবন্দনার পদ গাওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু প্রাচীন গায়কগণ আপত্তনের সূত্রে গৌরবন্দনা বা আবাহন করে থাকেন। আপত্তনের দুটি অংশ- পূর্বরূপ এবং উত্তররূপ যার আলাপ পর্যায়ে-

“এস হে, গৌর হে, তোমার ভাই নিতাইকে সঙ্গে করে
একবার দয়া করে এসো হে,
তুমি আসিলে আনন্দ হবে, একবার দয়া করে এসো হে,
তোমার ভক্তগণ তোমাকে ডাকে,
একবার দয়া করে এসো হে, তোমার সান্নিপাত সঙ্গে লয়ে,
একবার দয়া করে এসো হে।”^৫

নানাভাবে এই কথাগুলি উচ্চারণ করে গৌরবন্দনা করা হয়। গৌর ও নিতাইকে আহ্বান করার জন্য প্রচলিত একটি পদ-

“এস গৌরঙ্গ এস নিতাই।
এস দুটি ভাই গৌর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে।
পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে হে
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে
লক্ষ জনার মাঝে।
যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র
কেমনে সে বাজে।”-ইত্যাদি

খ) **পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা** -পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা হল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আদ্যন্ত কীর্তন। এই গানটিতে গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতা, শ্রীবাস ও গদাধর এই পঞ্চতত্ত্ব ছাড়াও গৌরপরিকরণের জয়সূচক গান থাকে। অত্যন্ত সহজ সুরে চতুর্মাত্রিক ছন্দের চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়। বোলটি হল-

বাঁ - দাঘি নাৎ তেই / খি - গুরুগুরু জাজজা /

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

এমন ছন্দে করতালের তিনটি করে আঘাত আর ভক্তদের মনের মত আখর সংযোজন করে গানটিকে ভরিয়ে তোলা হয়। এর পরবর্তী অনুষ্ঠানটি হল ভাগবত পাঠ। গানটির প্রথম চরণটি দাস পেড়ে তালের মধ্যগতিতে অথবা আলাপের মত করে গাওয়া হয়-

“জয় জয় নিত্যানন্দাঈত গৌরঙ্গ।

নিতাই, গৌরঙ্গ নিতাই গৌরঙ্গ||”

পরবর্তী অংশ চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়-

“জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।

জয়জয় মহাবিশ্বের অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ||

জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।

জয় জয় খন্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ||

জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজেন রায় ভবানন্দ।

জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচেন সেন শিবানন্দ

জয় জয় দ্বাদশগোপাল আদি চৌষট্টিমহান্ত।

জয় জয় ছয় চক্রবর্তী অষ্ট কবিরাজাচার্য্য||

জয় জয় উড়িয়া গৌড়ীয় যত গৌর ভক্তবৃন্দ।

তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ||

যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরঙ্গ।

তোমরা কৃপা করে দাও গৌরচরণারবৃন্দ||

(এবার আমায় দাও গৌর চরণ)”

ভক্তদের অতি প্রিয় এই গানটির সবকটি চরণ একই সুরে, সেজন্য প্রতি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় চরণটি একটু চড়িয়ে শুরু করা হয় মাত্র।

ঘ) রাধাকৃষ্ণ বন্দনা- পাঠের আঙ্গিককীর্তন, পাঠ শেষ হলে গাওয়া হয়। সুর, তাল ও পরিবেশনের দিক থেকে পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণ বন্দনা অবিকল একই, কেবল গানের কথাগুলি ভিন্ন। রাধাকৃষ্ণ গানটি হল-

যেমন- “জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ

রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ||”

এই অংশটুকু দাসপ্যারী তালের মধ্যগতিতে এবং পরের অংশটি দাসপ্যারী তালের ছোট গতিতে অর্থাৎ চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়।

“জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।

জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ||

জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।

জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ||
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ||
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।
তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ ||
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ।
তোমরা সবে মিলে দাও যুগল চরণারবৃন্দ||
(এবার আমায় দাও যুগল চরণ)''

ঙ) **বৈষ্ণব বন্দনা**- বৈষ্ণব বন্দনার পদ মহাজন পদাবলীতে অনেক আছে। কীর্তনের শেষে সবাই মিলে গানটি করে থাকেন। গানটির প্রথম চরণ- “হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম”-। যার উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে পাই। গানটি হল-

হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম||
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন||
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরিগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা||
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীবীজ গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ||
এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অস্তিত্ব পূরণ||
এই ছয় গোঁসাই যাঁর মুঁই তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস||
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ||
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ||
মনের আনন্দে বল বরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন||
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্তন করেন নরোত্তম দাস||^৫

পদটি সরল সুরে সহজ তালে সকলেই দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়।

২। প্রার্থনা কীর্তন -

ভক্তপ্রাণের আকুতি প্রকাশের জন্য আত্মনিবেদন দৈন্যবোধ বৃন্দাবন লালসা গৌরনিত্যানন্দনের চরণে শরণাগতি, বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও অভিলাষজ্ঞাপন ইত্যাদির অভিপ্রায়ে গানের উপযুক্ত করে বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেসব পদ রচনা করেছেন সেগুলিই হল প্রার্থনার পদ এবং সে গানগুলিই হল প্রার্থনা কীর্তন। এই প্রার্থনাগুলি বৈষ্ণবদের কণ্ঠহার, অনেক বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তা যেমন- গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ, রাধামোহন, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস প্রমুখ বহু প্রার্থনা পদ লিখেছেন। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী সম্পূর্ণ স্বকীয় সত্তা নিয়ে আজও অব্যাহত রূপে সকলকে আনন্দ দান করে। এই প্রার্থনা গানগুলিরও শ্রেণী আছে।

নিত্যানন্দের প্রতি আর্তি:

ক) প্রার্থনা কীর্তন - নরোত্তম ঠাকুর

নিতাই পদ কমল, কোটী চন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই।
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার||
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাশরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দুখানি||
নিতাইর চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা কর আশ
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ||

৩। আরতি কীর্তন:

আরতি কীর্তন বেশীর ভাগ ঠাকুর বাড়িতে নিত্যকৃত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিত্য না হলেও কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভক্তদের সমাগম হলে আরতির সময় কীর্তন গান হয়ে থাকে। সাধারণত শ্রীখোল, করতাল, কাঁসর, ঘন্টা ইত্যাদি সহযোগে। আরতি কীর্তন তিন প্রকার।

ক) মঙ্গল আরতি

খ) মধ্যকালীন ভোগ আরতি এবং

গ) সন্ধ্যা আরতি

৪। অধিবাস কীর্তন

শুভ অধিবাস কীর্তন হল মাসলিক আনুষ্ঠানিক কীর্তন। যার প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। পরদিন প্রাতঃকাল থেকে কীর্তনমহোৎসব শুরু হবে এমন সংকল্প করবার জন্যই এই অধিবাস কীর্তন। আট, ষোল, চব্বিশ ইত্যাদি বহু প্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন হতে পারে। আবার অষ্টকালীন লীলাকীর্তনও হতে পারে অথবা পছন্দমত নানাপ্রকার লীলা হতে পারে। এসব ক্ষেত্রেই অধিবাস কীর্তন শুরু হয় আগের দিন সন্ধ্যায়। নাটমন্দির বা প্যাভেলকে আমের পল্লব দিয়ে সাজিয়ে বিগ্রহের পূজা অভিমেক করা হয়। পূর্ণঘট স্থাপন করে, একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। গায়ক, বাদক ও শ্রোতা বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করতে হয়। ঠাকুর নয়নানন্দের রচিত “জয় রে জয় রে গোরা” এই গানটি বড় দশকুশী তালের গান হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ এবং অতি বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। বৃন্দাবনে গানটি মধ্যম দশকুশী তালে গাওয়া হয়। আখরের মাধুর্য নিয়ে মূল গানটি ভরপুর হয়ে উঠত। মূল গানটি হল-

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তান্তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্তন মঙ্গল||
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘন ঘন
কালই হবে কীর্তন মহোৎসব
আজু খোল মঙ্গল রাখয়ে আনন্দ করি
বংশী কহে দেহ জয় রব||

এই গানটি পরে নামকীর্তন করে খোল করতাল রেখে বিশ্রাম দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে মঙ্গল আরতির সময় পর্যন্ত এই অধিবাস পর্ব থাকে।

৫। পরবগান

“পরবগান”-কে বলা হয় “পর্বগান” অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান, বিশেষ পরবের দিনে গাওয়া হয় বলে এগুলি “পরবগান” বলা হয়। এই পর্বগুলি হল- হোরী, বুলন, রাস ইত্যাদি।

ক) হোরীলীলা – হোরীলীলা ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির লীলা এবং বসন্তের বিশেষ লীলা। বৃন্দাবনে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মহাসমারোহে মুক্ত মঞ্চের লীলাটি স্মরণ করা হয়। সকলেই ঠাকুরকে আবীর, রং ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এই তিথির অপর আকর্ষণ হল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

সঙ্গীত বিষয়ে এই হোরীলীলাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ধ্রুপদে হোরীগান গাওয়া হয়, হোরীতালে অর্থাৎ “ধামারতালে”। আঞ্চলিক পর্যায়ে লোকসঙ্গীত হিসাবে এই হোরীলীলার এসব প্রসিদ্ধ গান যখন গায়কের কণ্ঠে মধুর সুরে নির্গত হয় তখন লীলা মূর্তিমান হয়ে ওঠে। কালোচিত লীলা বলে ঋতুরাজ সমাগমের সরাজগোবিন্দের আচরণ যেমন মূর্তহয়, তেমনই রাইরসবতীর ফাওয়া মাখা বদনচাঁদ প্রত্যক্ষ উদয় হয় শ্রোতার সমক্ষে। বসন্ত মাখানো সুরের

ভাঁতি, কুসুমনাচা ঠমকি ছন্দ, ভক্তহংস বৃন্দের প্রেমসুধা পানের আকুতি আর গায়ক-বাদকের শৈল্পিক সংকলনবৃত্তি সবমিলে হোরীলীলার যে চমৎকারিতা সৃষ্টি হয়, তা থেকে উপলব্ধি হয় বাংলার সঙ্গীতের চিরন্তন এবং অবিনশ্বর ধারা।

খ) ঝুলনলীলা – ঝুলনলীলা হল বর্ষাকালোচিত লীলা। শ্রাবণ মাসের শুক্লাপক্ষ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই লীলা স্মরণ করা হয়। এই সময়ে প্রতিটি ঠাকুরবাড়িতে অতি সুন্দর দোলা সাজিয়ে, “হিন্দোলা”-য় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বসিয়ে ঝোলানো হয়। একেই বলে ঝুলনলীলা বা হিন্দোললীলা।

এই লীলা প্রসঙ্গটি শুরু হয় রাধারানীর অভিসার দিয়ে-

“ঝুলা ছলে ধনী চলে বিনোদিনী।

ললিতাদি সখি সঙ্গে||”^৫ – ইত্যাদি।

যার গৌরচন্দ্রিকা তেওট তালের - “ঢর ঢর কাঞ্চন নিন্দি কলেবর”, গড়াণহাটি ধারায়। এছাড়াও তেওট তালে-

“নওল নওলি নব রঙ্গমে, দুহু ঝুলত প্রেম তরঙ্গমে”

এর পরের অংশ-

“বদত ময়ূর

চাতক চকোর

কীর কোকিল অনগনি।

রটতা দরদা

তোয়ে দাদুরী

বুন্দ সুন্দর নেনি নেনি||”^৫

“বুন্দ সুন্দর” অর্থে বিরবির বৃষ্টি মকরন্দ বিন্দুর মত ঝুলন আয়োজিত হর্ষ-বর্ষদ কুঞ্জকে শোভা করেছে। গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি বিন্যাসের অপূর্ব বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

হিন্দোলা রচনার বিষয়ে যোগমায়ার অপূর্ব নিপুণতা, কদম্ববৃক্ষের সরল শাখা সংশ্লিষ্ট বঙ্গীয় চালাঘরের ভঙ্গিমা, তাঁরনীচেয় বেদী নির্মিত হয়- তারই নাম “মণিকুন্ডিম”। তার উপরেই থাকে “রতন হিন্দোল”, তার উপরে থাকে পরাগ রচিত পুষ্পশয্যা, এই হিন্দোলে রাধা গোবিন্দ যুগল হয়ে বসেন এবং সখীগণ ঝুলনা দুলাতে থাকেন।

আবার কখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পদযুগলের সাহায্যে দোলনাটি জোরে দোলাতে থাকেন।

রাধারানী ভীত হয়ে পড়েন-

“ঝুলনা ধমকে চমকে রাই, বিহসি মাধব ধরই তাই।

আনন্দে অবশ পরশ পাই, চাপি ধরই কোলরি||”^৫ – ইত্যাদি।

তখন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করে- “শ্যাম নাগর অতি বেগে ঝুলাইওনা”- এটি আড় তালের একটি প্রসিদ্ধ গান। রাধাগোবিন্দ মুখোমুখি গতিশীল ঝলনায়- প্রতিফলিত রশ্মি একে অন্যের অঙ্গে বর্ষিত হতে থাকে। শ্রীমতি রাধারানী ভাবেন হয়! প্রাণ বধু বুঝি নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণও তেমনি প্রেমকাকে নিমেষে হারান। কাছে থাকা সত্ত্বেও যখন উভয়ে উভয়ের অভাব বোধ করে থাকেন তখনই প্রেমবৈচিত্র্য এবং এই ভাবের সুন্দরতার প্রকাশ পাওয়া যায় ঝুলনলীলায়।

গ) শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা – ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আবির্ভাব হন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ঐ দিনটিকে বলা হয় জন্মাষ্টমী। কংসের কারাগারে চতুর্ভুজ নবজাত শিশুকে দেখে মাতা দেবকী স্তুতি শুরু করেন। বসুদেব দুরাচারী কংসের হাত থেকে

সন্তানকে রক্ষা করতে বজ্র-বৃষ্টি মাথায় করে যমুনা পার হয়ে নন্দালয়ে পৌঁছে দেন। নন্দালয়ে মা যশোদা এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন। এই কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে ফিরে এলেন বসুদেব দেবকীর কাছে। ঐ শিশুই কংস-নিধনের ভবিষ্যবাহী করে বললেন-

“তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে||”

পরদিন প্রাতঃকাল থেকে নন্দালয়ে শুরু হয় নন্দোৎসব। তবে এই লীলার গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পিতা নন্দের ভাবে বিভাবিত-

“পূরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজগণ লৈয়া হরষিত হইয়া
নন্দ মহোৎসব গায়||”^৬ -ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ে স্বর্গে যে আনন্দ উৎসব ও দেবগণের পুষ্প বরিষন তা পদাবলীতে উল্লেখ রয়েছে-

“স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ||”^৬

নন্দ নাচেরে গোবিন্দ পাইয়া, নন্দ নাচেরে, আনন্দ পাইয়া নন্দ নাচেরে, এই উৎসবে নন্দের মন্দিরে গোয়ালাগণ ধেয়ে এলেন-

“নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাঞা।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রইল||”^৬

ঘ) রাসলীলা – পরবগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হল রাসলীলা। এর দুটি প্রকারের মধ্যে একটি হল নিত্যরাস বা মহারাস, অপরটি শারদীয় রাস বা নর্তক রাস। নিত্যরাস সর্বকালীন- যেকোন সময়ে গাওয়া চলে। আর শারদীয় রাস দেবী ভাগবতীর শুভ বিজয়ার পরদিন যে একাদশী, সেদিন থেকে শুরু করে শারদীয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই লীলাটির গায়নকাল। বৈষ্ণবীয় মতে রাসের সূত্র ধরেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে রাগিনী ও নৃত্যের বিভিন্ন তালের উদ্ভব ঘটেছে। এখানে রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান- উভয়ের সম্পর্ক ভেদ হয়েও অভেদ। এই লীলাবিলাসের পরিণতি, রাই-কানু একাকৃতি হয়ে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব।

রাসলীলা প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেই আদর্শকে আশ্রয় করে পদরচয়িতা মহাজনগণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, যেগুলি সাঙ্গীতিক বিন্যাসে অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। এই লীলার গৌরচন্দ্রিকা। যেমন-

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ১। গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া। | মধ্যম দশকুশী তালের গান |
| ২। নাচে গৌর রাসরস অন্তর। | বড় দশকুশী তালের গান |

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

৩। বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল

যমুনার ভাবে সুর ধুনীরে করিল। সমতালের গান।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কলেবর পৃথকীকরণের কারণ হল লীলারস আশ্বাদন অর্থাৎ গোপীও কৃষ্ণ, পশু, পাখী ও বৃক্ষলতাদি সকলেই কৃষ্ণ। তাই-

“যাহাযাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্কুরে।”

দেহান্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গ উপাঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া সংকল্পেই ভগবানের লীলারূপে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ সামাজিক বিচারে নরলীলা হলেও এটি ভগবৎলীলা, তাই চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে-

“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম জিনি জন্মদ হেম

সে প্রেম নলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ কভু না হয় বিয়োগ

বিয়োগ হলে কভু না জীয়||”^৫

সমগ্র লীলার মূল আদর্শ হল প্রেম, আপাত বিচারে মনে হতে পারে সখীদের সঙ্কল্পে আত্মতুষ্টির প্রেরণা থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি হল কামগন্ধ-বিবর্জিত লীলা-

“আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম||”

সকলেই অভিলাষী- কেহদাস্য, কেহসখ্য, কেহশান্ত, কেহবাৎসল্য, কেহ মাধুর্য কিন্তু লক্ষ্য একটাই শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্থানই হল রাসস্থলী। রাসলীলায় প্রথম পদই হল-

“শারদচন্দ্রপনমন্দ,

বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ||”^৬ -ইত্যাদি।

৬। সূচককীর্তন

বৈষ্ণবআচার্য বৃন্দের বা গুরুবর্গের তিরোধান তিথিকে উপলক্ষ করে নির্দিষ্টতালে ও সুরে নির্দিষ্টচরিত গীত গেয়ে আচার্যকে স্মরণ করা হয় তাকে সূচক কীর্তন বলা হয়। যেমন- শ্রী গুরুপূর্ণিমা বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিকে জগদগুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর সূচক গাওয়া হয়। সূচক গানের ক্ষেত্রেও প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা করে নিতে হয়। এই গৌরচন্দ্রিকার নির্দিষ্ট গানটি হল বড়দশকুশীতালের-

“প্রেম সিদ্ধ গোরারায় নিতাই তরঙ্গতায়

করণা বাতাস চারিপাশে।

ভক্ত হংস চক্রবাকে

পিবি পিবি বলি ডাকে

তাপ তৃষ্ণা সবাকারনাশে||”^৭ -ইত্যাদি।

এই গৌরচন্দ্রিকা পরে সূচক কীর্তন শুরু হয়।

ঠাকুর নরোত্তম সূচক কীর্তন। যেমন-

“ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয়
নরোত্তম প্রেমের মুরতি।
কিবা সে কোমলতনু শিরীষ কুসুম যনু
জিনিয়া কনক দেহি দ্যুতি||”^৫ –ইত্যাদি।

৭। নাম সংকীৰ্তন

কীর্তন হল “বহুগণভিমলিত্বাত্ গান সুখম্”(নারদীয় পঞ্চরাত্র) অর্থাৎ অনেকে মিলে ভগবৎ - সুখ - নিমিত্ত ভগবৎ - সম্পর্কিত যে যে গান গেয়ে থাকেন তাই হল কীর্তন গান। ভগবৎ- সম্পর্কিত গান বলতে কি? এই প্রশ্নের সমাধান হয় শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তি- “ভগবদনামগুণলীলাদি উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।” ভগবানের নাম গুণ লীলা ইত্যাদির গান।

শ্রীচৈতন্যদেব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকে মিলে গাওয়া গান নাম সংকীর্তনের উপর। তাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম স্লোকেই তিনি বলেছেন-

“চৈতদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধুজীবনম্।
প্রতিপদপূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাঙ্গসমর্পণং
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ||”^৬

আবার বলেছেন- নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়। অর্থাৎ সংসারের দাবানলের দগ্ধ হতে হতে মানুষ যখন নিরুপায় এবং অসহায় হয়ে পড়বে, তখন তার রক্ষা পাবার একমাত্র পরম উপায় হবে নাম সংকীর্তন।

তাই শ্রীচৈতন্যদেব অঙ্গীকার করেছিলেন-

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম||
ঘরে ঘরে প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন||”^৭

শাস্ত্রমতে চারযুগের নাম-

১। সত্যযুগের নাম-

“নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাঙ্করা।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরা গতি||”^৮

২। ত্রেতাযুগের নাম-

“রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন||”^৯

৩। দ্বাপরযুগের নাম-

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে||
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষেণা
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ||”^৫

৪। কলিযুগের নাম-

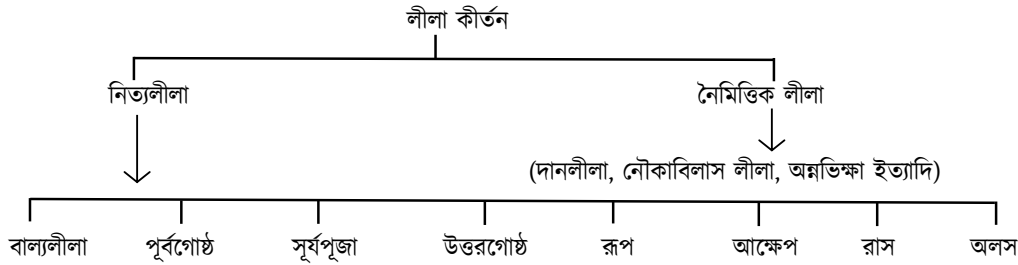
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।”^৫

এছাড়াও চৈতন্য যুগে আরও কিছু নামকীর্তন শুরু হয়-

- ১। “রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্||”^৫
- ২। “হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ||”^৫

লীলা কীর্তন -

যখন কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদগুলি মালা আকারে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় তাকে বলে পালা কীর্তন বা লীলা কীর্তন। এই লীলা কীর্তন আবার দুই প্রকার। যেমন- নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা।



নিত্যলীলা - ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন নিয়মিত সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত যে লীলাগুলি করতেন সেই লীলাগুলিকেই নিত্যলীলা বলা হয়।

বাল্যলীলা - যেমন সকাল ৬টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা যে লীলা হয়, তাকে বলে বাল্যলীলা অর্থাৎ সকালে মা যশোদা গোপালকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখাল বেশে সাজিয়ে, গোপালের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দাদা বলরাম ও সখাদের হাতে প্রাণের গোপালকে তুলে দিয়ে বিলাপ।

প্রধান পদ- কোলেতে করিয়া রাণী নিরখিয়া মুখ।

সুখের সাগরে ডুবে সব দুঃখ||^৬

পূর্বগোষ্ঠ - দাদা বলরাম ও সখাগণ সঙ্গে গোবৎস নিয়ে মহানন্দে গোচারণ ক্ষেত্রে গমনানন্দকেই বলে পূর্বগোষ্ঠ।

প্রধান পদ- জননী বিদায় করি, গোষ্ঠেরে চলিলা হরি, কহয়ে শুনরে ওরে ভাই।
না যাইব কোন মাঠ, চলু সবে গিরিতটে, হাঁকারিয়া দেহ সব গাই||^৬

সূর্যপূজা - শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন দর্শনের অভিলাষে সখীগণকে সঙ্গে লয়ে শাশুড়ী ও ননদীকে ফাঁকি দিয়ে সূর্যপূজার ছলা করে বনে গমন ও সূর্যদেবতা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করাই সূর্যপূজা।

প্রধান পদ- কুসুমিত কুঞ্জ, কলপ-তরু- কানন, মণিময় মন্ডপ মাঝ।
আইলা কলাবতি সবজন সংহতি, করে লই পূজন সাজ||^৬

উত্তরগোষ্ঠ - সারাদিন বনে ধেনু ফিরিয়ে ক্লান্ত রাখাল বালকগণ ঘরে ফিরছেন পাঁচুনি কাঁচনি দ্বারা ধেনু বৎসগুলিকে একত্রিত করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজিয়ে ধেনু বৎসগুলিকে ডাকিতে লাগিলেন- শ্যামলী, ধবলী, পিয়ালী আয়-আয়-আয়-আয় শ্যামলী, আয় ধবলী, আয় পিয়ালী এবং দাদা বলরাম শৃঙ্গ বাজাতে লাগলেন যেন আদেশ দিলেন আমাদের ফিরতে হবে কারণ মা আর্তি করছে, তাই বারবার বিষম লাগছে- এই উত্তরগোষ্ঠের একটি প্রসিদ্ধ পদ মুসলমান কবি নাসির মামুদের লেখা- “খেলত রাম সুন্দর শ্যাম মোহন মুরলী মধুর ধাম, নাসির মামুদ করত আস, চরণে স্থান দানরে।”

প্রধান পদ- পাল জড় কর শ্রীদাম শান দাও শৃঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়।^৬

রূপ - ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখে শ্রীমতি রাধারাণী তার অন্তরঙ্গ সখীদের বলেছেন, সখিরে বেলি অবসানকালে, শ্রীযমুনার জল আনতে গিয়ে যে অপরূপ রূপের মানুষ দেখে এলাম সেই রূপ বর্ণনা আমি এক মুখে আর কি বলবো, আর সেই রূপ আমার এই দুচোখে আর ধরে না, আক্ষেপ করে বলেছেন, বিধাতা দিল মাত্র দুটি নয়ন, তাই যদি দিলে বিধি কেন মীনের নয়ন দিলে না, আমি অপলকে চেয়ে রইতাম। তাই রাধাভাবাবৃষ্ট পদকর্তা দ্বিজ ভীমদাস বললেন-

“আমি কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি। পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ ত্রিনো ভুবনে। তুলনা নাহিক তার ||”^৬

আর কীর্তনীয়া আখর যোজনা করলেন, তাঁর তুলনা তারই সাজে, তার তুলনা নাহি এই ত্রিভুবনে, যার তুলনা তারই সাজে। ওরে ও বিশাখা তোদের কে আমি কি বা বলবো। সে যে অকলঙ্ক গুণনিধি।

রাধারাণী বললেন, জানিস সখী বিধাতা ভেবেছিলেন নিষ্কলঙ্ক চাঁদ নির্মাণ করবেন, আর সেই পূর্ণ চন্দ্র গোবিন্দের রূপের সঙ্গে তুলনা করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বিধাতা পনের দিন ধরে নির্মাণ করার পর দেখলেন গোবিন্দের মতো হল না। তাই আবার পনের দিন ধরে ভাঙলেন। এইভাবে ভাঙাগড়ার খেলা চলেই আসছে, তাই রূপের তুলনা আজও হলো না।

আক্ষেপানুরাগ - রাধা ভাবাবিষ্ট পদকর্তা জ্ঞানদাস তার পদে লিখেছেন-

“শ্রীমতি রাধারাণী বড় আক্ষেপ করে বলছেন সখিরে

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

আমি দেখে এলাম তারে গো সই। দেখে এলাম তারে।

তার এক অঙ্গে এত রূপ দুনয়নে না ধরে।”

আখর – আমার দুনয়নে ধরে না সই তাঁর এক অঙ্গে এত রূপ, তাই বিধিকে বড় আক্ষেপ করে বলেছেন- বিধি যদি দুটি নয়ন দিলে বিধি তবে কেন মীএর নয়ন দিলে না গো আমি অপলেকে চেয়ে রইতাম।

এই আক্ষেপ মুরলীর প্রতিও করেছেন শ্রীমতি রাধারাণী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হিসাবে। যে মুরলীর সুরে রাধারাণীকে ঘরছাড়া করতেন যখন তখন তাই পদকর্তা রাধা ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন-

“বাঁশি ভুমি যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশি
যদি ঝাড়ের নাগাল পেতাম।
ঝাড় উল্টে যমুনার জলে
ভাষায়ে দিতাম।” - তুক কীর্তন।

তেমনি আবার রাধারাণীকে বলা হচ্ছে-

রাসলীলা- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা হল রাসলীলা। রাধা-কৃষ্ণের পণ রেখে নৃত্য প্রতিযোগীতাই এই লীলার মূল বিষয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীকে বললেন।

“বিষম সংকট তালে বাজাইব বাঁশি।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রিয়সি||
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি।
জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী||”^৬
“যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই।”

হেরে যাবেন শ্যাম নাতার এমত সময়ে-

“মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিকে চায়
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে
দুখিনী কহিছে গোপীমন্ডলী হাসালে||”^৬

তাহলে রাসলীলায় দেখা যায় গীত-বাদ্য-নৃত্যের চূড়ান্ত পর্ব। সমস্ত দিকের শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সমন্বয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসলীলা।

অলস – যখন সারা রাত্রি নৃত্য, গীত আনন্দ করে শয়নে যান তাকে শয়নলীলা বা অলসলীলা বলে। পদাবলীতে পদকর্তা লিখলেন-

“রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে, এলুয়া অলস ভরে||
শুতলি কিশোরী, আপনা পাশরি, পরাণনাথের কোরে
নাগরের বাছ, সিথান করেছে, বিথান বসন ভূষা।
নাসার নিশ্বাসে, বেশর দোলিছে হাসিখানি আছে মিশা

পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে।

ধীরে করি বোল, না করিহ রোল দাস জগন্নাথ ভনে||”^৬

নৈমিত্তিক লীলা – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একদিকে যেমন রয়েছে নিত্যলীলা, অন্যদিকে তেমনি নৈমিত্তিক লীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন সময়ে বিশেষ কারণবশত কোন লীলা করলে তাকেই বলা হয় নৈমিত্তিক লীলা। যেমন- দানলীলা, নৌকাবিলাস লীলা, মৃত্তিকা ভক্ষণ, দামবন্ধন ইত্যাদি।

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেবের “নৃত্য সংকীর্তন”-এর যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, আজও তার জনপ্রিয়তা মন্দিরগুলিতে, বৈষ্ণব আখড়ায় এবং পাড়ায় পাড়ায়। চৈতন্যদেব বলেছিলেন-

পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে নগরাদি গ্রাম

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম||

তার প্রমাণ আজ সারা বিশ্ব জুড়ে অগণিত মানুষ নাম সংকীর্তনে নৃত্যানন্দে বিভোর।

যদি নাট্যশাস্ত্রের যুগে ফিরে যাই, সেখানে দেখতে পাই বাংলায় নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে ধ্রুপদী নৃত্যের চর্চা হত। “অঙ্গ বঙ্গ উৎ-কলিঙ্গ বৎসাইচৌদ্দমাগধা” অর্থাৎ বাংলায় “উদ্ভুতমাগধী” নৃত্য ধারার প্রচলন ছিল এবং ঐ নৃত্যের বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথোপকথনের সঙ্গে উচ্চন্দ এবং কৈশিকী অর্থাৎ লাভণ্যমন্ডিত নৃত্য। যা কীর্তনে দেখা যায়। অষ্টম শতকে কলহণের রাজতরঙ্গিনীতে এরকম স্পষ্ট নজির আছে। নাট্যশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে দেবদাসীরা নাচত। দেবমন্দিরের দেবতাদের যশোমহিমা অর্থাৎ কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করতেন। এখনও মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা যায় শ্রীখোল করতালসহ দেবদাসীদের নৃত্যকীর্তন করতে।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে নৃত্য কীর্তন নবকলেবর ধারণ করে। নাট্যশাস্ত্রের যুগে কথোপকথন সংস্কৃতে হত, এখন বাংলায় হয়। মহাপ্রভু সংকীর্তনে দুই প্রকার নৃত্য করতেন- উচ্চন্দ ও মধুর।

নাট্যশাস্ত্রে যে বৃন্দগানের দলের উল্লেখ আছে, সাংগঠনিক বিশ্লেষণে কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মূখ্যগায়ন, সমগায়ন, মাদ্ধঙ্গিক ইত্যাদি যে ভাষা প্রয়োগ দেখি, বাংলার কীর্তনের দলে সে পরিভাষাগুলি পাই- মূলগায়ন, সমগায়ন বা দোঁহার, বায়ান ইত্যাদি। অধমবৃন্দে একজন মূখ্য গায়ন, চারজন সমগায়ন এবং দুজন মাদ্ধঙ্গিক থাকে। কীর্তনের দলেও ঠিক তাই। তাই বলা যায় দল গঠন বিশ্লেষণে বৃন্দগানের ধারাই কীর্তনে বিদ্যমান। শার্ঙ্গদেব “এলা” প্রবন্ধের যে রূপটি উল্লেখ করেছেন কীর্তনে সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে।

“সঙ্গীত রত্নাকর” গ্রন্থে সঙ্গীতের স্বরূপ ভিত্তিক ভারতভূমিকে যে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ ভারতের পূর্বাংশে প্রচলিত এলাকে গৌড়োলা বলা হয়েছে।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর লীলাচলে বঙ্গদেশের সাত সম্প্রদায় ভক্তদের নিয়ে যে “মহা নৃত্য সংকীর্তন” করেছিলেন, সেখানে দেখা যায়, চৌদ্দ মৃদঙ্গ আর ছাপান্ন জোড়া করতাল বেজে ছিল। মূখ্য চার সম্প্রদায়ের বিবরণ-

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

ক্র: নং	প্রধান গায়ন	দোহার	মৃদঙ্গ	নর্তক
১।	স্বরূপ	পাঁচজন	গোবিন্দ	অদ্বৈত
২।	শ্রীবাস	পাঁচজন	শ্রীমান শুভানন্দ	নিত্যানন্দ
৩।	মুকুন্দ দত্ত	পাঁচজন	শ্রীকান্ত	হরিদাস
৪।	গোবিন্দ ঘোষ	পাঁচজন	বিষ্ণুদাস	বক্রেস্বর

এছাড়াও বঙ্গদেশের তিন সম্প্রদায় হল- ১) কুলীন গ্রামের, ২) শান্তিপুরের, ৩) শ্রীখন্ডের। এখানে নৃত্য করেছিলেন- সত্যরাজ, রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন। এই সাত সম্প্রদায়ের এই কীর্তন ও মহাপ্রভুর “উচ্চন্দনৃত্য” মানুষের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিলেন। শেষে তিনি “মধুর নৃত্য” করেছিলেন।

নৃত্যের প্রারম্ভে মহাপ্রভু কীর্তনীয়াদের সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে এক একজন মহাজনকে নৃত্য করতে আদেশ দেন।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেস্বর।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পন্ডিত আর গোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।
বাসুদেব রঘুনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বঙ্কভ সেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্তন॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করে তাঁহা পন্ডিত বক্রেস্বর॥
কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ, সত্যরাজ॥
সত্যরাজ আচার্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খন্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।

নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন||
শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করে সংকীর্তন সহযোগে, যা “বেড়া কীর্তন” নামে প্রসিদ্ধ। প্রভাতী বেড়া কীর্তনে শ্রীচৈতন্যদেব সাত সম্প্রদায় নিয়ে নৃত্য সংকীর্তন করেছিলেন। উচ্চন্ড নৃত্যের শেষে তিনি নিজেই এই চমৎকার ওড়িয়া পদটি গেয়ে মধুর নৃত্য করেছিলেন-

জগমোহন পরিমুভা যাই
মনমাতিলা রে চকা চন্দ্রকু গাঞি।
অদ্বৈত, মুকুন্দ ও স্বরূপ- এঁনারা শ্রীচৈতন্যদেবকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিয়ে তাঁর কৃষ্ণবিরহ দাহে শান্তির প্রলেপ দিতেন। বৈষ্ণব সমাজে পদাবলী কীর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। কীর্তনে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।
দ্বাদশ শতকের পণ্ডিত গোবর্ধন আচার্য রচিত “আর্য্য সপ্তশতী”-তে নৃত্য গীতের সঙ্গে হস্ত তালের দ্বারা সংগত করা হত- “কৃতহসিত হস্ত তালং”। এই তালির দ্বারা তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি সুপ্রাচীন। চৈতন্য ভাগবতে উক্ত রয়েছে “দিশা দেখায় প্রভু হাতে তালি দিয়া”।

বৈষ্ণব পদাবলীতে নৃত্য সম্বন্ধীয় বর্ণনায় উজ্জ্বল। যেমন- গোষ্ঠলীলার একটি পদ-

নাচরে নাচরে মোর দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর-ননী-সর||
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার||
চামর ব্যঞ্জন সহ নৃত্যের একটি বর্ণনা পাই মণিপুরী নৃত্যের একটি গানে -
চারিদিকে সূচাতরী ধরল চামর রে।
দোলাইয়া রাধার অঙ্গে সেবন করে||
নানা ছন্দবদ্ধ নাচে চামর লইয়া।
তার মাঝে চাঁদ যৈছে রাধারে ঘিরিয়া||

অষ্টাদশ শতকে নরহরি চক্রবর্তী রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ “শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর”-এ বলরাম নর্তনের বর্ণনা পাই-
নৃত্যতি বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি অঙ্গ
দাঁ দাঁ দূমি দূমি দূমি কট, ধা দৃণ্ড দৃণ্ড ধা
ধিথুঙ্কট তক তক ধিকি তক খোতি কুকু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ||

“গীত রত্নাবলী”-তে রাসের একটি পদে পাই-

চাঁদ বদনী নাচত দেখি -
তা তা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ-
তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ- তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ-
তা তা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ-
দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি ধেই,
তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তাঙা তা,
গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি ঝাঁ- ঝাঁ-
তা তা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ-

শর্ত রইল -

না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চির।
দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জুর||
বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী।
ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রিয়সি||
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচুলি।
জিনিলে তোমার দিব মোহন মুরলী||

তখন নৃত্যে হেরে গিয়ে শ্যাম নাগর মুরলী লুকায়ে চারিদিকে চাইছেন। বুঝি এবার সাধের মুরলীটি গেল।

সবাই বলে রাইর জয় নাগর হারিলে।
দুখুনী কহিছে গোপীমন্ডলী হাসালে||

এর উত্তর পদাবলীতে কিভাবে দিয়েছেন পদকর্তা। শ্রীমতি রাধারাণীকে যেভাবে বিষম সঙ্কট কালে পণ রেখে নৃত্য করিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে গোপিনীগণ পণ রেখে নৃত্য করালেন-

শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে-

দিগেদা ঝিনে কেটা থোরলাগ জিগ ঝাঁ,
থোরলাগ জিগ ঝাঁ, থোরলাগ জিগ ঝাঁ,
থোর উরলাগ ঝিনি, থোর উরলাগ ঝিনি, থোর উরলাগ ঝিনি ঝাঁ-
তিনিকিটি তিনিকিটি তিনিকিটি তিনিকিটি তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ- (বাজে)
লাগঝিনি লাগঝিনি লাগঝিনি লাগঝিনি লাগঝিনি লাগঝিনি ঝাঁ- (বাজে)
লাগঝিনি লাগঝিনি ঝাঁ- লাগঝিনি লাগঝিনি ঝাঁ- লাগঝিনি লাগঝিনি ঝাঁ-

শর্ত রইল -

না নড়িবে গন্ড মুন্ড নূপুরের কড়াই।
না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই||
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘৃষ্টি শ্রবণের কুন্তল।
না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল||
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ।
সুচিত্রা বাজায় সগুসরা রাই দেখে রঙ্গ||
তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তুমুরা রঙ্গ দেবী।
ইন্দ্ররেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী||
উদ্ভট তালে যদি হার বনমালী।
চুড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি||

যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী।
নইলে কারাগারে রাখিব দুখিনী গুনি হাসি।

পদাবলীতে প্রমাণিত হয় শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবে পণ রেখে রাধারানীকে নৃত্য করিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণকেও রাধারানীর সখীগণ নৃত্য করালেন পণের শর্ত রেখে।

এককথায় বলা যায়, নৃত্যের প্রতিযোগিতা। নর্তন রাসেই কীর্তনের গীত-বাদ্য-নৃত্যের চরম অবস্থাটি পরিগণিত হয়। যেখানে তালের নাম পাওয়া যায়- বিষম সঙ্কট ও উদভট্ট এবং পণ রাখা হয় রাধারানী হারলে সখীসহ রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের দাসী হবেন। আর শ্রীকৃষ্ণ হারলে তাঁর সাধের মুরলী সখীদের হাতে দিয়ে দেবেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে গীত-বাদ্য-নৃত্যের বর্ণনা শুধু যে হিন্দু পদকর্তাগণই করেছেন তাই নয়, মুসলমান পদকর্তারা লিখেছিলেন অসংখ্য পদাবলী- “গৌরপদ তরঙ্গিনী”-তে আকবর সাহাবর একটি ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়-

জিউ জিউ মন চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভেরা।।
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া।।
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোলিয়া।।
ঐছন পছকে যাছ বলিহারি।
সাহা আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।।

শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ণনে নৃত্যরূপ দেখে পদকর্তা আকবর সাহা কতখানি আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য এই পদটি বহন করছে।

অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাংলায় নৃত্যের গভীর অনুশীলন ছিল। ফলে নানা সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা পাই।

শ্রীখোল বা মৃদঙ্গের গুরুত্ব

কীর্তন গানে ও গোড়ীয় নৃত্যে মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলের গুরুত্ব জানার আগে বাদ্যযন্ত্রটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা দরকার।

সঙ্গীতের ইতিহাসে বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি, গঠন এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত ত্রিধারার সমন্বয়ে (গীত, বাদ্য, নৃত্য) গঠিত। বহু প্রাচীন সঙ্গীত সাহিত্যে তার বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও মতান্তর রয়েছে।

- ১। সামবেদ সূত্র
- ২। নাট্যশাস্ত্র
- ৩। ভরতর্পণ

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখোলের গুরুত্ব

- ৪। সঙ্গীত মকরন্দ
- ৫। সঙ্গীত চূড়ামণি
- ৬। সঙ্গীত রত্নাকর
- ৭। সঙ্গীত দামোদর

শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বাদ্যযন্ত্রগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| ১। ততযন্ত্র - | তন্ত্রীযুক্ত বীণাদি |
| ২। সুমির যন্ত্র | - বায়ুচালিত বংশীআদি |
| ৩। আনন্দ যন্ত্র | - চর্মাচ্ছাদিত মৃদঙ্গাদি |
| ৪। ঘন যন্ত্র | - ধাতু নির্মিত করতালাদি |

আমার আলোচ্য বিষয় হল আনন্দ বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল।

নাট্যশাস্ত্র বিচারে স্বাতিমুনি বর্ষাকালে পদ্মপুকুরে বৃষ্টির ছোট বড় তির্যক শব্দ শুনে আশ্রমে এসে বিশ্বকর্মার সহায়তায় মাটির মৃদঙ্গের অসমান মুখদ্বয় চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করলেন। পরবর্তীকালে পণর, দন্দুর নানা পুস্করজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বানালেন।

অপর একটি মতে শ্রীহরির কর্ণমূল থেকে জন্ম নেয় মধু ও কৈটভ। অসুরদ্বয় বাহুবলে ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হন। এই দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হন। স্বয়ং বিষ্ণু বিশ্বকর্মা-কে আদেশ দিলেন ঐ মাটি দিয়েই মৃদঙ্গ নির্মাণ করতে। মৃদঙ্গের প্রণাম মন্ত্রে রয়েছে-

“মৃদঙ্গ ব্রহ্ম রূপায় লাবণ্যম্ রস মাধুরী

সহস্রগুণ সংযুক্তম্ মৃদঙ্গায়ৈ নমো নমঃ||”^৭

খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত-

১। মৃদঙ্গ, ২। পণর, ৩। দন্দুর, ৪। মরজ ইত্যাদি বহু প্রকার বাদ্যাদির নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু বাদ্য নতুন সংযোজন ঘটে।

খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ তারপর থেকে ভারতীয় সঙ্গীতে আরও পরিবর্তন ঘটে এবং বাদ্যযন্ত্র ক্ষেত্রেও একইভাবে পরিবর্তন ঘটে। যেমন- পাখোওয়াজ (মৃদঙ্গ), ২। খোল (মৃদঙ্গ), ৩। ঢোল, ৪। তবলা বাঁয়া, ৫। নাল, ৬। চচ্চরী।

বাদ্যযন্ত্র গুলির ব্যবহার ভেদে শ্রেণীবিন্যাস

১। সংগ্রামিক- যে বাদ্য যুদ্ধের সময় বাদিত হয়। ২। বহির্দ্বারিক- দ্বারের বাহিরে বাদিত হয়। ৩। আনুষ্ঠানিক- যে বাদ্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদিতে বাদিত হয়, ৪। মাঙ্গলিক- যে বাদ্য মাঙ্গলিক ক্রিয়াদিতে বাদিত হয়।

মৃদঙ্গ মাঙ্গলিক শ্রেণীর বাদ্য তাই যুগে যুগে দেবতার সামিধ্য লাভ করে এসেছে। বৃন্দাবন লীলায় বিভিন্ন পদাবলীতে মৃদঙ্গ নামের উল্লেখ আছে। যেমন, রাসলীলায়-

“ললিতা বাজায় বীনা বিশাখা মৃদঙ্গ।

সুচিত্রা বাজায় সপ্তসরা রাই দেখে রঙ্গ||”^১

আবার গৌরচন্দ্রিকায় রয়েছে-

“খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।

তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া||”^২

এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

অতি বাদিত (হাতুটি) সমবাদিত (সঙ্গত) অনুবাদিত ছোট অলঙ্কার।

তবে বর্তমানে শ্রীখেলের নানাপ্রকার ব্যবহার ঘটেছে শিল্পীদের চর্চাচিন্তার উৎকর্ষতায়। এইভাবেই সঙ্গীতের বিবর্তন ঘটেই চলেছে নিরন্তর এবং বাদ্যযন্ত্রগুলিরও বিবর্তন ঘটে চলেছে।

এই শ্রীখোল বাদ্যযন্ত্রটির যুগে যুগে বিবর্তনের পথে মুখাকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে নানা কারণে। কিন্তু সনাতন ভারতের প্রধান ভক্তিমূলক সঙ্গীত ধারা কীর্তনে তার ব্যবহার ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। আবার এই বাদ্যযন্ত্রটির বিশেষ আকর্ষণীয় পরিবেশ হল নৃত্য ভঙ্গিমা যাকে আমরা গৌড়ীয় বলে থাকি। পরিশেষে বলতে পারি নৃত্য কীর্তনের গান পরিবেশনের যে ধারা, তার সহযোগী বাদ্য হিসাবে একমাত্র খোল বা মৃদঙ্গ শ্রেয়।

উপসংহার:

“কীর্তন কী রতন” আশ্বাদনেই তো অনুভব করা যায়। কীর্তন এক অমূল্যরতন যার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা এবং ফুলে রয়েছে সঙ্গীতের চরম মাধুর্য। তাই কীর্তন গানে ব্যবহৃত সুর ও তালের সতন্ত্রতা ও সঙ্গীতের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নির্দর্শন। যেমন, একটি বিষয়কে অবলম্বন করে পালা বা লীলা, বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদাবলী গুলি সাজিয়ে। আবার বিভিন্ন পালাগুলি সাজিয়ে কখন আস্টোকালীন, কখন চব্বিশপ্রহর, কখন আটচল্লিশপ্রহর, কখনও চৌষট্টিপ্রহর ইত্যাদি। আবার কখন নিত্যলীলা, আবার কখন নৈমিত্তিকলীলা।

কীর্তনের মধ্যে দেখা যায়, আপত্তনকীর্তন, বন্দনাকীর্তন, প্রার্থনাকীর্তন, সূচককীর্তন, নামকীর্তন, লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন।

কীর্তনের মধ্যে রয়েছে ভনীতা আখর, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং সুরের মাধুর্য।

অন্যদিকে তালের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন- লোফা, দাসপেড়ে, তেওট, দুঠুকি, শশীশেখর, দশকুশি (ছোট, মধ্য ও বড়)। এছাড়াও বিরম দশকুশি, কাটাদশকুশি ইত্যাদি তালের ব্যবহারও যথেষ্ট সতন্ত্রতা রয়েছে। কাটান, মাতান, মেলমূর্চ্ছান ইত্যাদি। শ্রীখোলবাদ্যের বিশেষ চমকপ্রদ রূপ সেইসঙ্গে কীর্তনের আনন্দ মানুষের মনকে করে তোলে মাতোয়ারা।

“কীর্তন কি ধন, বোঝে সেইজন

যে করিয়াছে কণ্ঠভুষণ।

বাংলার কীর্তনে মৃদঙ্গ / শ্রীখেলের গুরুত্ব

পাইয়া রতন

না বুঝিল যতন

জনম করিলি দুষণ।”

কীর্তন ও শ্রীখোল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক। কীর্তনের আখর সেই সঙ্গে শ্রীখেলের কাটন, মাতান অবশেষে মুচ্ছান আর কোন গান বাদ্যের মধ্যে এভাবে দেখা যায় না। কীর্তনের ভাবকে প্রকাশ করতে যে শব্দের মধুরতা প্রয়োজন তা মধুর মৃদঙ্গেই সম্ভব। কীর্তন গানে শ্রীখেলের মাতনে মানুষের যে উদ্ভূত নৃত্য, ভাব নৃত্য শ্রীখোল নৃত্য এসব গৌড়ীয় নৃত্যেই সম্ভব। গীত-বাদ্য-নৃত্যে যে পূর্ণনিন্দ এই গৌড়ীয় সঙ্গীত কীর্তন, গৌড়ীয় নৃত্য এবং গৌড়ীয় বাদ্য মৃদঙ্গ বা শ্রীখোলেই প্রকাশ পায়।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। সাহা, বঙ্কুবিসারী. *শ্রীশ্রী গীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৯, পুনঃমুদ্রিত আশ্বিন, ১৪২৪।
- ২। ঠাকুর গোস্বামী, ভাগবৎ শ্রীল, ১৪১০ বঙ্গাব্দ. প্রবন্ধাবলী, মিত্র আর্ট প্রিন্টার্স, ৩৩ বি রাজা রামমোহন রায় সরণি, কোলকাতা-৯,
- ৩। চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর. ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫. *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কোলকাতা-৬।
- ৪। দাস, সনাতন. আষাঢ় ১৪২০ বঙ্গাব্দ. *শ্রীভক্ত কণ্ঠভূষণ*, চিকণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩বি নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ২য় লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী।
- ৫। মহারাজ, হরিজন. ২২শে ফাল্গুন ১৪১০ বঙ্গাব্দ। *শ্রীভক্তিজীবন ত্রিভঙ্গীস্বামী, শ্রীশ্রী গৌরপার্ষদ চরিতাবলী*, গৌড়ীয় মিশন বাগবাজার, কোলকাতা-৩
- ৬। রায়, বুদ্ধদেব (সম্পাদনা), দাস, ব্রজরাখাল (সংকলন), আগষ্ট ১৯৯৩, *শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি*, আদিনাথ ব্রাদার্স, ৯নং শ্যাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।
- ৭। চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর. ফেব্রুয়ারী-১৯৮৬. *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ*, সাহিত্যলোক, ফার্মা কে এল এম থাইভেট লিমিটেড ২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২।
- ৮। চক্রবর্তী, মৃগাঙ্কশেখর. ফেব্রুয়ারী-১৯৯৫. *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কোলকাতা-৬।
- ৯। মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ. আগষ্ট ১৯৯০ . *বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।
- ১০। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, বিদ্যাপতি পদাবলী, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২।
- ১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র, চক্রবর্তী ছন্দা, মার্চ ১৯৮০. *বঙ্গানুবাদ ভরত নাট্যশাস্ত্র*, নব প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ওকলকাতা-৭৩।
- ১২। মুখোপাধ্যায়, মহুয়া. অক্টোবর ২০০৯. *অনুবাদ সঙ্গীত দামোদর*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।
- ১৩। মুখোপাধ্যায়, মহুয়া. জানুয়ারী ২০০৪ . *গৌড়ীয় নৃত্য*, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ পার্ক স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।

- ১৪| মুখোপাধ্যায়, শঙ্করলাল. ১৯৯৭. *ভারতীয় নৃত্যধারার সমীক্ষা*, কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২।
- ১৫| বসুমতী সাহিত্য মন্দির, জ্ঞানদাস পদাবলী, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২।
- ১৬| বসুমতী সাহিত্য মন্দির, গোবিন্দ দাস পদাবলী, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২।
- ১৭| দাসগুপ্তা মানস, দাসগুপ্তা মমতা, জ্যেষ্ঠ ১৪০২ . *তাল অভিধান*, পূর্বচল এস্টেট, কোলকাতা-৯১।

লেখক পরিচিতিঃ

^১ শ্রীখোল বাদক এবং অতিথি প্রভাষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

এ-গ্রেড শিল্পী, অল ইন্ডিয়া রেডিও

রিসার্চ ফেলো, ভারত সরকার

প্রতিষ্ঠাতা- শ্রীখোল একাডেমি এবং পরিচালক- মৃদঙ্গ আশ্রম

^২ অধ্যাপক, নৃত্য বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন, চারুকলা অনুষদ প্রধান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়